লেখক পরিচিতি

জন্ম ও পরিচয়

এক শ হিজরি সনের কাছাকাছি কোনো-এক সময়ের কথা। হানযালা গোত্রের এক ব্যবসায়ী তার তুর্কি গোলামকে ডেকে বললেন, "মুবারাক, আমাদের বাগান থেকে মিষ্টি দেখে একটি ডালিম নিয়ে এসো তো।" মুবারাকের নিয়ে-আসা ডালিমটি মুখে দিয়ে তিনি বললেন, "এ তো টক! যাও, আরেকটা আনো।" কিন্তু মুবারাক যে ডালিমটিই নিয়ে আসেন, প্রতিটিই টক স্বাদের। বিরক্ত হয়ে ব্যবসায়ী লোকটি বললেন, "এত বছর বাগানে কাজ করেও মিষ্টি ডালিম চিনলে না, অপদার্থ কোথাকার!" মুবারাক জবাব দিলেন, "আপনি তো কখনও আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি। চিনব কী করে?"

কথাটি ব্যবসায়ীর হৃদয় ছুঁয়ে গেল। দাসেরা তো এমনিই কাজ করার ফাঁকে কিছু খেয়ে ফেলে, কিছু পকেটে পুরে নেয়। আর এই লোক কিনা জীবনে একটিও চেখে দেখেনি! কথায় আছে, জাহিলি যুগের মুশরিকরা বিয়ে করত বংশ দেখে, ইয়াহূদিরা সম্পদ দেখে, আর খ্রিস্টানরা সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ প্রাধান্য দেয় দ্বীনকে। সেই হানযালি ব্যবসায়ী আপন মেয়েকে বিয়ে দেন মুবারাক রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে। এই দম্পতির কোল আলো করে ১১৮ হিজরি সনের দিকে খুরাসানের মারও শহরে জন্ম নেন বহুমুখী প্রতিভাধর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক।

খুরাসান হলো বর্তমান আফগানিস্তান ও সংলগ্ন মধ্য এশিয়া-জুড়ে বিস্তৃত এলাকাটির প্রাচীন নাম। আর মারও শহরটি ঐতিহাসিকভাবেই জ্ঞানচর্চার খনি। আহমাদ ইবনু হাম্বল আর সুফইয়ান সাওরির মতো সব্যসাচীদের এখানেই জন্ম।

ইলমের খোঁজে

কারও জ্ঞানের ব্যাপ্তি অনুমান করা যায় তার সফরের পরিমাণ দেখে। বিশেষত ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য। তেইশ বছর বয়সে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক

জন্মস্থান ছেড়ে ইলমের সন্ধানে বের হন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের যুগে তাঁর মতো জ্ঞান-অন্বেষক আর কেউ ছিলেন না। তিনি ইয়ামান, মিসর ও সিরিয়ায় সফর করেছেন, বসরা ও কুফায় সফর করেছেন। ইলমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছোটোদের থেকেও সংকলন করেছেন, বড়োদের থেকে সংকলন করেছেন। তিনি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষণ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর খুব কমই ভ্রান্তি ঘটত; এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।"[১]

জ্ঞানকে সাধনা বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। আবূ খারাশ একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান, আপনি আর কত দিন জ্ঞান অন্বেষণ করবেন? তিনি বললেন, হয়তো সেই কথাটি পর্যন্ত যাতে আমার মুক্তি রয়েছে। এরপর আমি আর কোনো কথা শুনতে পাব না।[২]

হাদীসের বর্ণনাসূত্রের মান (বিশুদ্ধ অথবা বানোয়াট) যাচাই করার শাস্ত্রকে বলা হয় 'জারহ ওয়া তা'দিল'। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক নিজেও ছিলেন জারহ-তা'দিলের তুখোড় বিশেষজ্ঞ। আবার তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসগুলোও জারহ-তা'দিলের মানদণ্ডে নিশ্চিতভাবে উত্তীর্ণ। ইমাম বুখারি তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি ইবনুল মুবারকের বর্ণনা নিয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করত, তাদের ইলমি যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠানো হতো। আসওয়াদ ইবনু সালিম বলেন, "যদি দেখো যে, কেউ ইবনুল মুবারককে খাটো করছে, তা হলে উলটো তার ধার্মিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলবে।"

সমসাময়িক চারজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন—সুফইয়ান সাওরি, মালিক ইবনু আনাস, হাম্মাদ বিন যায়দ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। সুফইয়ান সাওরির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ইবনুল মুবারককে সুফইয়ান সাওরির চেয়ে জ্ঞানী ধরা হতো। এমনকি সুফইয়ান নিজেই সে সাক্ষ্য দেন। ইবনু আবী জামিল বলেন, "মক্কায় একবার ইবনুল মুবারকের কাছে গিয়ে আমরা বললাম, 'প্রাচ্যের শাইখ, আমাদের কিছু হাদীস শেখান।' একটু দূরে থাকা সুফইয়ান সাওরি বললেন, 'এটা কী বললে? তিনি তো বরং পূর্ব, পশ্চিম এবং এর মধ্যকার সব জায়গার শাইখ।"

অর্জিত-শিক্ষা লিখে রাখার ব্যাপারেও তার বেশ সুনাম ছিল। লিখার উপকরণ সুলভ হওয়ার আগে এ ধরনের অভ্যাস থাকা মানে আসলেই বিশেষ-কিছু। তিনি বলেছেন, "পোশাকে কালির দাগ আলিমের চিহ্ন।" বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া এবং প্রাপ্ত জ্ঞান

---

[১] তারিখু দিমাশ্‌ক, ৩৮/৩১১।

[২] তারিখু দিমাশ্‌ক, ৩৮/৩১২; সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৮।

লিখে রাখার মাধ্যমে তিনি তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। যা-ই শুনতেন, মনে রাখতে পারতেন। হুসাইন ইবনু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বন্ধু আমাকে বলেছেন, "আমরা লেখকদের (হাদীস সংকলনকারীদের) মধ্যে ছিলাম বয়সে ছোটো। আমি ও ইবনুল মুবারক একবার একটি মজলিসে গেলাম। ওখানে একজন লোক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পর ইবনুল মুবারক আমাকে বললেন, আমি লোকটির খুতবা মুখস্থ করে ফেলেছি। ওই এলাকার একজন লোক তাঁর কথা শুনে বলল, বক্তৃতাটি আমাকে শোনাও। ইবনুল মুবারক বক্তৃতাটি তাদের মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।"[৩]

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেছেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার বাবা আমাকে বললেন, আমি যদি তোমার বই-পুস্তক দেখি সেগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেব। আমি বললাম, তাতে আমার কোনো দুঃখ হবে না। সেগুলো আমার বুকের মধ্যেই আছে।"[৪]

কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুখস্থ থাকলেই কিন্তু যে-কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়া যায় না। একই বিষয়ক একাধিক আয়াত-হাদীস, সেগুলোর পটভূমি-অর্থ-ব্যাখ্যা সবকিছু বুঝে নিয়ে তবেই সেখান থেকে বিধান বের করতে হয়। এভাবে বিধান বের করার শাস্ত্রকে বলা হয় ফিকহ। তাই হাদীস বিশারদ মানেই ফিকহ-বিশেষজ্ঞ নন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক ও সুফইয়ান সাওরির মতো বিজ্ঞ ফকীহগণের কাছে তিনি ফিকহের শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়াও হাজার হাজার শাইখের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন তিনি। নিজেই বলেছেন, "আমি চার হাজার শাইখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি, কিন্তু মাত্র এক হাজার শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি।"[৫]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক অনেক তাবিয়ির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হিশাম ইবনু উরওয়াহ, ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ, আ'মাশ, সুলাইমান তাইমি, হামিদ তাবিল, আবদুল্লাহ ইবনু আওন, খালিদ ইবনু মিহরান হাযযা, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনসারি, মূসা ইবনু উকবা প্রমুখ।"[৬]

তাঁর ছাত্রসংখ্যা অনেক। ইউসুফ ইবনু আবদির রহমান মিয্যি রহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ

---

[৩] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৫, ১৬৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৯৩।

[৪] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৯৩।

[৫] তাযকিরাতুল হুফফায, ১/২৭৬।

[৬] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৪৬।

ইবনুল মুবারকের এক শ তেতাল্লিশ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।[৭] এ ছাড়া সুফইয়ান সাওরি, মা'মার ইবনু রাশিদ, দাউদ ইবনু সুলাইমান, মুসলিম ইবনু ইবরাহীম-সহ আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮]

ইমাম যাহাবি বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছ থেকে এত জায়গার এত মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের গুণনা করে শেষ হবে না।"

বিদআতবিদ্বেষী সংস্কারক

ইবনুল মুবারক বলেছেন, "গরিবদের সাথে মেলামেশা করো। আর বিদআতিদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান!"

জীবদ্দশায়ই তিনি মুতাযিলা, কাদরিয়্যা এবং জাহমিয়্যা নামক ভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলোর উত্থান দেখেছেন। আমৃত্যু তিনি এসকল পথভ্রষ্ট দলের ও এগুলোর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। একবার তিনি বললেন, "আমি শাইখ সুফইয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি যে, জাহমিয়্যা এবং কাদরিয়্যা দল-দুটি কাফির।" আম্মার ইবনু আবদিল জাব্বার তা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নিজের কী মত?" ইবনুল মুবারক উত্তর দেন, "আমারও একই মত।"

এই ভ্রান্ত দলগুলোর সাথে সহানুভূতিমূলক আচরণকেও তিনি ঘৃণা করতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, হারিস মুহাসাবি কোনো-এক কুখ্যাত বিদআতির সাথে বসে খাবার খেয়েছেন। ইবনুল মুবারক তাকে বললেন, "ত্রিশ দিন আপনার সাথে কোনো কথা বলব না আমি।"

ভ্রান্ত মতানুসারীরাও হাদীস বর্ণনা করত। জ্ঞানের ময়দানে পারদর্শীরা এই মানদণ্ড ঠিক করেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তদের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে আর কোন ক্ষেত্রে তা করা যাবে না। যারা নিজেরা ভ্রান্ত হলেও সেই মত প্রচার করে বেড়াত না, তাদের থেকে ইবনুল মুবারক বর্ণনা নিতেন। কিন্তু যারা সেসব মত প্রচার করত, তাদের থেকে নিতেন না। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি সাঈদ এবং হিশাম-এর কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা গ্রহণ করেন, কিন্তু (মুতাযিলা ফিরকার নেতা) আমর ইবনু উবাইদের ক্ষেত্রে তা করেন না কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "কারণ আমর তার মত প্রচার করে বেড়ায়, কিন্তু বাকি দুজন নিজেরটা নিজের কাছে রাখে।"

---

[৭] তাহযীবুল কামাল, ১৬/১০-১৪।

[৮] তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৫-৩৩৬।

উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা বলেন, "আমরা একবার আবূ হামযার ওখানে ছিলাম। এমন সময় ইবনুল মুবারক সেখানে এলেন (হাদীসের) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। আবূ হামযা তখন উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি অপমানজনক একটি কথা বর্ণনা করলেন। ইবনুল মুবারক সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন; এতক্ষণ যা লিখেছিলেন, সব ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন।"

বীর মুজাহিদ

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক শুধু জ্ঞানের মাধ্যমেই না, অস্ত্রের মাধ্যমেও ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছেন। এক বছর হাজ্জ করা, আর পরের বছর জিহাদে যাওয়াটা ছিল তার আমৃত্যু অভ্যাস। এমনকি তাঁর মৃত্যুও হয় একটি জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর। বিশেষত রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে তিনি বেশি পরিচিত। রোমান-ভূমির অদূরে তারসুস এবং মাসসিয়া এলাকায় প্রায়ই তিনি রিবাত বা সীমান্তপ্রহরার দায়িত্ব পালন করতেন। রিবাতে যাওয়ার আগেও তিনি মুজাহিদদের একত্র করে হাদীস শিক্ষা দিতেন, ফিরে আসার পরও তা-ই করতেন। মুজাহিদগণ হাদীস শুনে শুনে লিখে নিতেন।

তারসুসে অবস্থানকালে একবার জিহাদের ডাক আসে। মুসলিম ও রোমান সেনারা সারি বেঁধে মুখোমুখি হয়। এক কাফির-সৈনিক এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। এতে সাড়া দিয়ে একজন মুজাহিদ এগিয়ে যান। কিন্তু কাফিরটি দ্বন্দ্বে জিতে যায় এবং তাকে হত্যা করে। এভাবে ছয়জন মুজাহিদ একে একে শহীদ হন। অহংকারী ভঙ্গিতে কাফিরটি দুই-দল সৈনিকের মাঝে হাঁটতে থাকে এবং নতুন কাউকে আহ্বান করে। কিন্তু মুসলিমদের মাঝ থেকে কেউই এগিয়ে যাওয়ার সাহস পেলেন না। এমন-সময় আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এগিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর কাফিরটিকে কতল করে ফেলেন তিনি। এরপর নতুন কাউকে এসে দ্বন্দ্ব শুরু করার আহ্বান জানান। একে একে ছয়টি কাফিরসেনা তাঁর হাতে মারা গেল। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আবারও আহ্বান জানান, যাতে নতুন কেউ এসে দ্বন্দ্ব লড়ে। এবার আর রোমানদের পক্ষ থেকে কেউই এগিয়ে আসার সাহস পেল না

প্রখ্যাত কবি

পার্থিব ও ধর্মীয় বিদ্যার নানা শাখায় পারদর্শিতার পাশাপাশি ইবনুল মুবারক একজন দক্ষ কবি। সমসাময়িক নানা বিষয়ে (ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ) তিনি

উপদেশের ভঙ্গিতে কবিতা লিখতেন। এর কয়েকটির ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় :

দ্বীন ছেড়ে সুখী হবে ভেবেছিল যারা,
দুনিয়া নিয়ে সুখে নেই তারা,
দ্বীন নিয়ে খুশি থাকো, দুনিয়া ছেড়ে দাও রাজাদের হাতে
যেভাবে তারা দুনিয়া আঁকড়ে দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের পাতে।

ইলম-চর্চা ও ইবাদাতের জন্য তিনি প্রায়ই একা থাকতেন। লোকে তা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, আমার এমন সঙ্গী আছে, যাদের কথা আমায় ক্লান্ত করে না। শয়নে-জাগরণে তাঁরা আমার বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান সাথি।

অন্যান্য ইবাদাতের ওপর জিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে ফুযাইল ইবনু ইয়াযের কাছে চিঠিতে তিনি লিখেন,

ওহে দুই পবিত্র মসজিদে বসে ইবাদাতকারী,
আমাদের ইবাদাত দেখলে নিজের ইবাদাতকে ছেলেখেলা ভাবতে।
তোমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে,
আর আমাদের ঘাড় বেয়ে রক্তের ধারা ছোটে।

রাজদরবারের পদ-পদবি গ্রহণ করা এক আলিমের উদ্দেশ্যে তিনি চিঠি লিখেন,

জ্ঞানকে শিকারী পাখি বানানো হে জ্ঞানী,
তুমি তা দিয়ে শিকার করবে গরিবের ধন।
সুচতুরভাবে দ্বীনকে ছুড়ে ফেলে
তুমি বেছে নিলে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস।

সফল ব্যবসায়ী

দুনিয়াবিরাগ আর সম্পদশালীতার বিরল মেলবন্ধন ঘটেছিল ইবনুল মুবারকের মাঝে। তাঁর বাবা যেহেতু একজন ব্যবসায়ীর দাস ছিলেন, তাই উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান পেয়ে যান। এ ছাড়া ইমাম আবূ হানিফার কাছেও তিনি ব্যবসার খুঁটিনাটি শিখেছিলেন। জায়গায় জায়গায় ব্যবসা করে তিনি বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেন। মূলত এই সম্পদই তিনি জ্ঞানার্জনের সফরে ব্যয় করেন।

আলি ইবনুল ফুদাইলের সাথে এক কথোপকথন থেকে তাঁর সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য

সম্পর্কে জানা যায়। আলি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের দুনিয়াবিমুখিতার কথা বলেন, অথচ আপনি নিজেই এত সম্পদের মালিক। এটা কেন?" ইবনুল মুবারক বলেন, "অন্যের কাছে ছোটো না হওয়া (ঋণগ্রস্ত না হওয়া) এবং আল্লাহর ইবাদাতে সহজতার জন্যই আমি এগুলো উপার্জন করি।"

সৌজন্য ও দানশীলতা

ইয়াহইয়া বলেছেন, "আমরা ইমাম মালিকের মজলিসে বসে ছিলাম। ইবনুল মুবারকের জন্য মজলিসে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হলো। তিনি অনুমতি দিলেন। ইবনুল মুবারক প্রবেশ করলে, আমরা দেখলাম, মালিক সরে বসলেন এবং তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। আমি ইমাম মালিককে কখনও তাঁর মজলিসে কারও জন্য সরে বসতে দেখিনি। কেবল ইবনুল মুবারকের জন্যই সরে বসলেন। হাদীস-পাঠকারী হাদীস পাঠ করে যাচ্ছিলেন। কোনো কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে মালিক জিজ্ঞেস করছিলেন, এই হাদীসের ব্যাপারে কী তথ্য আছে আপনার কাছে? ইবনুল মুবারক চুপি চুপি তার জবাব দিচ্ছিলেন। দরস শেষ হলে ইবনুল মুবারক বেরিয়ে গেলেন। ইমাম মালিক তাঁর সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতায় বিস্মিত বোধ করলেন। আমাদের বললেন, ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, খুরাসানের ফকীহ।"[৯]

ইবনুল মুবারক ছিলেন উত্তম আখলাক ও শিষ্টাচারের অধিকারী, আচার-আচরণ ছিল চমৎকার। একইভাবে তিনি ছিলেন দানশীল। বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য মানুষের জন্য প্রচুর খরচ করতেন। এ ব্যাপারে অনেক ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ঘন ঘন তারসুসে যেতেন। ওখানে রিক্কার একটি অঞ্চলে তিনি যাত্রাবিরতি করতেন। একজন যুবক তাঁর কাছে বারবার আসত, তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিত এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনত। তিনি একবার ওখানে গিয়ে যুবকটিকে আসতে দেখলেন না। লোকদের কাছে যুবকটির ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বলল, দশ হাজার দিরহাম ঋণের কারণে যুবকটিকে আটক করে রাখা হয়েছে। ইবনুল মুবারক খুঁজে খুঁজে ঋণদাতাকে বের করলেন এবং তাকে দশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করলেন। লোকটির কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করলেন যে, তিনি যেন এ ব্যাপারে কাউকে কিছু না জানান। ইবনুল মুবারক চুপে চুপে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে যুবকটি তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তিনি জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ছিলে তুমি? তোমাকে দেখিনি কেন? যুবকটি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান, ঋণের কারণে আটক ছিলাম।

---

[৯] তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৭।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে মুক্তি পেলে? যুবকটি বলল, একজন লোক এসে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। আমি তাঁকে চিনি না। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর শুকরিয়া করো। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর পূর্বে যুবকটি জানতে পারল না যে, কে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিল।[১০]

নিজে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তো সফর করেছেনই, ছাত্র ও হাজিদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন দেদারসে। হাজ্জের মৌসুম এলেই হাজ্জ-করতে-আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁর কাছে টাকা জমা রাখতেন। তারপর তাঁর সাথে একই কাফেলায় রওনা হতেন হাজ্জে। পথে তিনি সকলকে প্রচুর পরিমাণে আতিথেয়তা করতেন। মক্কা-মদীনা থেকে তাদের পরিবার ও সন্তানদের জন্য কিছু কিনে দিতেন। হাজ্জ শেষে ফিরে আসার পর তাদের জমা রাখা সেই টাকা আবার ফিরিয়ে দিতেন তাদেরই কাছে।

ইসলামি শিক্ষার্থীরা কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাদের ঋণ তিনি পরিশোধ করে দিতেন। খুব করে চাইতেন তালিবুল ইলমরা যেন টাকার জন্য কারও কাছে ছোটো না হয়। নিজ শহরের বাইরের ইসলামি শিক্ষার্থীদের পেছনে টাকা খরচ করতেন বলে মারওবাসীরা প্রায়ই ইবনুল মুবারকের সমালোচনা করত। তিনি বলতেন, "জনগণের জ্ঞান প্রয়োজন বলেই তো তারা আমাদের হয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে। আমরা তাদের সম্পদের প্রয়োজন পূরণ না করলে এই উম্মাহ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।"

পরিচিতজনদের তো বটেই, অপরিচিতদের বিপুল আর্থিক সাহায্য প্রদানের ঘটনাও তাঁর জীবনে অনেক। হাজ্জযাত্রার পথে এক জায়গায় তিনি এক নারীকে মরা হাঁসের পালক ছিলতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এটা জবাই করেছেন তো? নাহলে তো খাওয়া হালাল হবে না।" মহিলা বলল, "রাখেন আপনার ওসব কথা। আমি আর আমার সন্তানেরা যে অভাবে আছি, তাতে আবর্জনার-স্তূপে-পাওয়া মরা-প্রাণী আমাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে।" ইবনুল মুবারক খোঁজখবর নিয়ে এর সত্যতা পেলে হাজ্জযাত্রার পুরো টাকা তাদের দিয়ে দেন। বলেন, "নফল হাজ্জ করার চেয়ে এই আমল উত্তম।" সে বছর আর তাঁর হাজ্জ করা হয়নি।

অন্য হাজিরা হাজ্জ শেষে তার সাথে কুশল বিনিময় করতে আসেন। তিনি বলেন, "আমি তো এ বছর যাইনি।" একেকজন অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বলেন কী? আমার অমুক জিনিসটা না আপনার কাছে রেখে আবার ফেরত নিলাম?...আপনার সাথে না অমুক জায়গায় দেখা করলাম?" ইত্যাদি। ইবনুল মুবারক বলেন, "কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

---

[১০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৮৬-৩৮৭; তারিখু বাগদাদ, ১০/১৫৫; সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৪২।

কিছুদিন পর স্বপ্নে এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলে, "আনন্দিত হোন, আবদুল্লাহ! আল্লাহ আপনার সদাকা কবুল করে নিয়েছেন এবং এক ফেরেশতাকে দিয়ে আপনার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করিয়ে নিয়েছেন।"

দুনিয়াবিরাগী আবিদ

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যুদ্ধের ময়দানে ঠিকই বীরত্ব দেখাতেন। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে গনীমাতের মাল বণ্টনের সময় প্রায়ই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। মূলত এই দুনিয়াবিরাগই ইবনুল মুবারকের প্রসিদ্ধির সবচেয়ে বড়ো কারণ।

ইবনুল মুবারকের শুধু বেশি বেশি ও নিয়মিত নফল ইবাদাত করেই ক্ষান্ত হননি, মানুষের কাছ থেকে সেগুলো যথাযথভাবে গোপন রাখারও চেষ্টা করেছেন। যতটুকু স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে গেছে, সে ব্যাপারে তাঁর আশপাশের মানুষদের সাক্ষ্য দেখলে অবাক হতে হয়। আলি ইবনুল হাসান বলেছেন, "ইবনুল মুবারকের চেয়ে বেশি ও সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে এবং তাঁর চেয়ে বেশি সালাত পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি। বাড়িতে থাকুন বা সফরে, তাঁর সালাতের পরিমাণ ও তিলাওয়াতের সৌন্দর্য কিছুমাত্র কমত না। মুসাফির অবস্থায় তিনি রাতের বেলা উঠে সালাতে চলে যেতেন, সফরসঙ্গীরা কখনও জানতেও পারেনি।"

যুদ্ধকালীন এক-রাতে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার ভান করেন। সবাইকে ঘুমিয়ে যেতে দেখার পর উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে চলে যান। সকালে জানতে পারেন যে, আরেক সঙ্গীও ঘুমের ভান করে তাঁর সালাত পড়া দেখে ফেলেছেন। লজ্জায়-সংকোচে তিনি আর সেই সঙ্গীর সাথে কথা বলেননি।

মানুষের অধিকার ও সন্দেহমুক্ত হালাল উপার্জনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। শামে (বৃহত্তর সিরিয়ায়) থাকা অবস্থায় একবার তাঁর কলম ভেঙে যায়। আরেকজনের একটি কলম ধার নিয়ে তিনি বাকি লেখার কাজ সারেন। কিন্তু পরে তা ফেরত দিতে ভুলে যান এবং সেটি নিয়েই চলে আসেন খুরাসানে। এসে যখন কলমটি খেয়াল করলেন, শুধু তা ফেরত দেওয়ার জন্যই আবার শামে ফিরে যান। তিনি বলতেন, "লাখ লাখ দিরহাম সদাকা করার চেয়ে সন্দেহপূর্ণ উপায়ে উপার্জিত একটি দিরহাম ছুড়ে ফেলে দেওয়া আমার বেশি প্রিয়।"[১১]-[১২]

---

[১১] তারিখু দিমাশ্‌ক, ৩৮/২৪০।

[১২] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৯।

ইবনুল মুবারকের ইবাদাতে এমন-কোনো বৈশিষ্ট্য তো অবশ্যই ছিল, যার ওসিলায় তাঁর সকল দুআ কবুল হতো। হাসান ইবনু ঈসা তাঁকে বলতেন 'মুজাবুদ দাওয়াহ' (যার দুআ কবুল করা হয়)। এই হাসান নিজেই তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি আগে খ্রিস্টান ছিলেন। ইবনুল মুবারক দুআ করেছিলেন, "হে আল্লাহ, তাকে মুসলিম বানিয়ে দিন।" আল্লাহ সে দুআ কবুল করেন এবং হাসান ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিনয় ও নম্রতার ভূষণেও ভূষিত করেছিলেন। একবার তিনি কুফায় ছিলেন। তাঁকে হাজ্জের আহকাম-সম্বলিত হাদীসের কিতাব পড়ে শোনানো হচ্ছিল। একটি হাদীসের শেষে পড়া হলো : 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, আমরা এই হাদীসের ওপর আমল করি।' ইবনুল মুবারক বললেন, 'আমার এই কথা কে লিখেছে?' হাসান জবাব দিলেন, 'যে লেখক হাদীস লিখেছেন তিনিই লিখেছেন।' তিনি হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পাণ্ডুলিপি থেকে এই কথাটুকু তুলে ফেললেন। তারপর পাঠদান শুরু করলেন। বললেন, 'আমি এমন কে যে আমার কথা লিখে রাখতে হবে?'"[১৩]

হাসান রহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন ইবনুল মুবারকের সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি পানিপানের কূপের কাছে এলাম। কূপের কাছে লোকদের ভিড় লেগে ছিল, সবাই পানি পান করছিল। ইবনুল মুবারকও পানি পানের কূপটির কাছে যেতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে চিনল না। তাঁকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল। ভিড় থেকে বের হয়ে এসে বললেন, জীবন তো এ-রকমই। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না সেখানে আমাদের কেউ সম্মান দেখায় না।[১৪]

তাঁর ব্যাপারে আলিমদের প্রশংসা

মুমিনের নগদ সুসংবাদ ও প্রাপ্তি হলো তার জন্য মানুষের প্রশংসা। যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মানুষের প্রশংসা যথেষ্টই পেয়েছেন। ফুযাইল বলেছেন, "নিশ্চয় আমি তাঁকে ভালোবাসি, কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করেন।"

যাহাবি বলেছেন, "আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তাঁকে ভালোবাসার দ্বারা কল্যাণ কামনা করি; কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন তাকওয়া, ইবাদাতের শক্তি, ইখলাস, জিহাদ, জ্ঞানের প্রাচুর্য, দৃঢ়তা, মহানুভবতা,

---

[১৩] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৫।

[১৪] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৪-১৩৫।

বীরত্ব ও প্রশংসনীয় গুণাবলি।”[১৫]

মু‘তামার ইবনু সুলাইমান বলেছেন, “আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো কাউকে দেখিনি; তাঁর কাছে আমরা এমন-কিছু পেয়েছি যা আর কারও কাছে পাওয়া যায়নি।”[১৬]

আবদুল ওয়াহাব ইবনুল হাকাম বলেছেন, “আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মৃত্যুবরণ করলে খলিফা হারুনুর রশীদ মন্তব্য করেছেন, আমরা শ্রেষ্ঠ আলিমকে হারালাম।’ [১৭]

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, “ইবনুল মুবারক ছিলেন মুসলমানদের মহান নেতাদের একজন।”[১৮]

আলি ইবনুল মাদানি বলেছেন, “দুজন ব্যক্তির মধ্যে ইলমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে : তাঁদের প্রথমজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং দ্বিতীয়জন হলে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন।”[১৯]

শুআইব ইবনু হারব বর্ণনা করেছেন, সুফইয়ান সাওরি বলেন, “আমি গোটা জীবন ধরে একটি বছর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো হতে চেয়েছি। কিন্তু তিন দিনও তাঁর মতো হতে পারেনি।”[২০]

খারিজা তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন, “তোমাদের কেউ যদি সাহাবিদের মতো কাউকে দেখতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দেখে।” [২১]

ইবনুল মুবারকের রচনাবলি

১। তাফসীর : শামসুদ্দীন দাউদি এই তাফসীরের কথা “তাবাকাতুল মুফাসসিরীন”-এ উল্লেখ করেছেন।[২২]

২। আল-মুসনাদ : এটি হাসান ইবনু সুফইয়ান ইবনু আমির নাসাবি (মৃ. ৩০৩

---

[১৫] তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১/২৫৭।

[১৬] তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৭।

[১৭] সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৩৯০।

[১৮] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৫।

[১৯] প্রাগুক্ত।

[২০] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬২।

[২১] তারিখু দিমাশ্‌ক, ৩৮/৩৩৫।

[২২] তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, ১/২৫০।

হিজরি) কর্তৃক সংকলিত। হিজরি নবম শতাব্দীতে সৌদি আরবের জিযানের জাহিরিয়া এলাকায় এর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। Fuat Sezgin তাঁর রচিত বিশ্বকোষ Geschichte des Arabischen Schrifttums[২৩] (১৯৬৭-২০০০)-এর এই পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন।

৩। কিতাবুল জিহাদ : গ্রন্থটি ড. নাযিহ হাম্মাদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে এবং দারুল মাতবুআত আল-হাদীসা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪। আস-সুনান : শামসুদ্দীন দাউদি "তাবাকাতুল মুফাসসিরীন"-এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। ইবনুন নাদিম এটিকে 'আস-সুনান ফিল ফিকহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫। কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ : ইবনুন নাদিম ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬। কিতাবুত তারিখ : ইবনুন নাদিম ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

৭। রিফাউল ফাতাওয়া : হাজি খলিফা ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৮। আরবাঈনা ফিল হাদীস : হাজি খলিফা ও খাতিব বাগদাদি 'আল-আরবাঈনা' নামে উল্লেখ করেছেন।

৯। কিতাবুয্ যুহদ ওয়ার-রাকায়িক : বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর এ কিতাবটিরই অনুবাদ।

মৃত্যু

যার জীবন যেভাবে কাটে, তার মৃত্যু সেভাবেই হয়। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মৃত্যু এই বাস্তবতার সাক্ষী। ১৮১ হিজরি (৭৮৭ ঈসায়ি) সনের পবিত্র রমাদান মাস। তাঁর বয়স তখন ৬৩ বছর। এক জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর ভোরবেলায় তাঁর রূহ আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত আছে যে, ইরাকের বাগদাদে ফুরাত নদীর নিকটবর্তী এক এলাকায় তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি নাসরকে বলেন, "আমার মাথাটা মেঝেতে রেখে দিন।" নাসরকে কাঁদতে দেখে তিনি বলেন, "কাঁদছেন কেন?" নাসর জবাব দেন, "জীবদ্দশায় আপনি কত সচ্ছল ছিলেন। কিন্তু আজ নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশ-বিভূঁইয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ

---

[২৩] আরবি সাহিত্যের ইতিহাস।

করছেন।” ইবনুল মুবারক বললেন, “এভাবে বলবেন না। আমি দুআই করেছিলাম যাতে সচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়ে মিসকিনের মতো মারা যাই। সেটাই হয়েছে। আমাকে কালিমার তালকিন দিতে থাকুন, যেন ওটাই আমার শেষ কথা হয়।”

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা যথার্থই বলেছেন, “সাহাবা আর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মাঝে একটিই পার্থক্য যে, তাঁরা সাহাবা আর ইনি সাহাবি নন। আর বাকি সব বিষয় তাঁদের মাঝে একইরকম।”

ইসলামের হাজারও মনীষী কোনো-না-কোনো কর্মক্ষেত্রে বাতিঘরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। নেতৃত্ব, জ্ঞানচর্চা, রাজনীতি, সমরকৌশল, ব্যবসায়, সাহিত্য—একেকজনের একেক জায়গায় পারদর্শিতা। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সমান দক্ষতায় বিচরণের দুর্লভ সম্মান খুব কম মানুষই পেয়েছেন। সেই অভিজাত শ্রেণিরই একজন হলেন খুরাসানি আলিম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনু ওয়াযিহ হানযালি তামীমি রহিমাহুল্লাহ।

বিখ্যাত ফকীহ, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, কালজয়ী মুজাহিদ, আবিদ, যাহিদ, কবি, ব্যাকরণ ও ভাষাবিদ, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের প্রতি আল্লাহ তাআলা রহম করুন। আমীন।

অনুবাদকের কথা

যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো, দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা। দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার নাম যুহ্‌দ নয়। সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতাই হলো যুহ্‌দ। শুকনো খাবার খাওয়া আর আলখাল্লা পরিধানের নাম যুহ্‌দ নয়।"[২৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহ্‌দ তিন পর্যায়ের : ১. হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা, এটা সাধারণ মানুষের যুহ্‌দ বা পরহেজগারিতা। ২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা বা যতুটুক দরকার তারচেয়ে বেশি গ্রহণ না করা। এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্‌দ। ৩. যুহ্‌দের উচ্চতর পর্যায় হলো, আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর প্রেমে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী জিনিস-সমূহ পরিত্যাগ করা। আল্লাহর নূর দ্বারা যাদের অন্তর আলোকিত। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃত যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ কে? এমন প্রশ্নের জবাবে ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হারাম বস্তু ও অর্থ তাঁর ধৈর্যকে পরাভূত করবে না এবং হালাল বস্তুর আধিক্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে তাকে বিরত রাখবে না।[২৫] অর্থাৎ, হারাম সম্পদ যদি তাঁর পায়ের কাছে বিপুল পরিমাণেও পড়ে থাকে, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং এসব সম্পদ দূরে সরিয়ে দেবেন। আর হালাল সম্পদ আল্লাহর নিয়ামতরূপে গ্রহণ করবেন। উপকারী ও ভালো কাজে তা ব্যয় করবেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টিই যুহ্‌দের মূলকথা।"[২৬]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যাহিদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তার পোশাকে আড়ম্বর থাকবে না, তার পানাহারে বিলাস থাকবে না। তিনি যেখানেই থাকবেন এবং যে অবস্থাতেই থাকবেন, সব সময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবেন। যারা সত্য ও সততার ওপর রয়েছে তারা

---

[২৪] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম।

[২৫] প্রাগুক্ত।

[২৬] প্রাগুক্ত।

তাকে বন্ধু মনে করবেন এবং বাতিলপন্থীরা তাকে ভয় করবে। তিনি হবেন উপকারী বৃষ্টির মতো। সবাই তার থেকে উপকার গ্রহণ করবে। তিনি এমন বৃক্ষের মতো যার পাতা কখনও ঝরে পড়ে না। যার ফলমূল, ডালপালা, এমনকি কাঁটাও উপকারী। তাঁর অন্তর সব সময় আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকে। আল্লাহর স্মরণে তার আত্মা প্রশান্ত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সব সময় তার সঙ্গে রয়েছেন।[২৭]

ইসলাম সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে বলে না। বরং যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা পরিত্যাগ করতে বলে। যুহ্দের মৌলিক তাৎপর্য হলো—সব ধরনের পাপাচার ও সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা। চারিত্রিক সততা ও আত্মিক পবিত্রতা যুহ্দের পূর্বশর্ত। পাপ ও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে যুহ্দ ও তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়।

আমাদের সালফে সালেহীনগণ যুহ্দ-বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর 'কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক'-এর অনুবাদ। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা ড. আহমদ ফরিদ কর্তৃক সম্পাদিত 'কিতাবুয্ যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক'-এর ওপর নির্ভরশীল থেকেছি।[২৮] মূল কিতাবে হাদীসের সংখ্যাক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ১২১০। কিন্তু একটি হাদীস অনুপস্থিত। সে হিসেবে মূল কিতাবে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০৯। পাঁচটি হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সনদ উল্লেখ থাকায় আমরা তা ফুটনোটে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি একটি হাদীস জাল চিহ্নিত হওয়ায় সেটিও বাদ দিতে হয়েছে। মূল নুসখায় সকল অনুচ্ছেদের শিরোনাম ছিল না। কিন্তু পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রতিটি অনুচ্ছেদের নাম যুক্ত করে দিয়েছি। পাশাপাশি প্রতিটি হাদীসের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনামও যুক্ত করা হয়েছে।

পাঠকদের বোধগম্যতার স্বার্থে অনুবাদ মূলানুগ থেকেও সাবলীল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বোদ্ধা পাঠকদের নজরে যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে আমাদের তা জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। বইটি প্রকাশের সকল স্তরে যারা শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com

---

[২৭] প্রাগুক্ত।

[২৮] দারু ইবনিল জাওযি, কায়রো, মিসর থেকে ২০১১ সালে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।